তিরিশে জানুয়ারীর প্রসঙ্গে

অঃ সুপ্রিয় মুন্সী

একটু গ্রাম্য হলেও একটি ছড়ার দুটি পংক্তির কথা মনে আসছে -

"সুখ নেইকো মনে,
নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে
হলুদ গাঁদা বনে।"

সুখ বা happiness-এর আধার কোথায়? আজ থেকে অনেক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন ইউরোপে। ফিরে এসে লিখছেন যে সেখানকার চিন্তাশীল মনীষীরা উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে বসেছেন - এত বিদ্যা, এত জ্ঞান, এত শক্তি, এত সম্পদ, কিন্তু কেন সুখ নেই, কেন শান্তি নেই। প্রতি মুহূর্তে সকলে শঙ্কিত হয়ে আছে কখন একটা ভীষণ উপদ্রব প্রলয় কান্ড বাধিয়ে দেবে। কেন এমন হয়!

মানুষ সুখী হয় সেখানেই যেখানে মানুষের সম্বন্ধ সত্য হয়ে ওঠে অর্থাৎ মানব-সম্বন্ধ। ক্ষমতার লোভে, ভোগ লিপ্সায়, ঐশ্বর্য, সম্পদ সৃষ্টিতে আমরা ছুটে চলেছি, কখন হারিয়ে ফেলেছি সভ্যতার মূল সম্পদ 'মানবতা'। আজ সেটিই ঘটেছে। শক্তির বিকাশ ঘটেছে, কিন্তু মানুষী সম্বন্ধ বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হয়েছে, শক্তি শক্তিশেল হয়ে উঠে এক মানুষ অপর মানুষকে মারছে, শোষণ করছে, মিথ্যার সৃষ্টি করছে। অর্থাৎ মানুষের যে স্বাভাবিক ধর্ম তা বিস্মরণ হয়েছে। তিরিশে জানুয়ারীর তাৎপর্য এখানেই, শিক্ষা এখানেই। যদি সুখ, শান্তি পেতে চাই, তবে আত্মীয়তা, পারস্পরিক সম্পর্ক বিকাশের, অন্যের মধ্যে আপনার প্রকাশের প্রচেষ্টা চাই, প্রয়োজনে আত্মদানের পরিবর্তেও।

গান্ধীজী যখন শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ১৩৩৭ বাংলা সনের চৈত্র মাসে, "তিনি অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী যদি আসেন দেশশুদ্ধ লোক ক্ষেপে যাবে, সকলে তাঁর চরণ ধুলো নেবে। কিন্তু তাঁর না আছে অর্থ, না আছে বাহুবল। কিন্তু আছে হৃদয়.....তিনি মানুষের সম্পর্ককে বড়ো করে স্বীকার করেছেন, আপনাকে স্বতন্ত্র করে রাখেননি, তিনি আমাদের, আমরা তাঁর।".....

গান্ধীজীর শরীরি-বিদায়ের প্রায় একান্ন বছর বাদে সারা পৃথিবী জুড়ে সত্যদ্রষ্টা কবিগুরুর এই উপলব্ধির অনুরণন কি আমরা শুনতে, দেখতে পাচ্ছি না! চিন্তাশীল মণীষীরা উপলব্ধী করছেন যে হয়ত গান্ধী প্রদর্শিত পথেই প্রকৃত সুখ ও শান্তি আসতে পারে। আজকের এই স্মরণ ও মননের প্রয়োজনীয়তা তাই গভীর।

বস্তুতঃ মানুষের শুভ, মঙ্গল চিন্তায় কত মতবাদ, দর্শনের উদ্ভাবন ও প্রয়োগ হয়েছে, কিন্তু জীবন জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে, ভেদভাব আরো তীব্র হয়েছে, হানাহানি, দুর্নীতি, শোষণের মাত্রা ও ব্যাপকতা গেছে বেড়ে, প্রকৃতিও যার থেকে পায়নি রেহাই। এরও পরে মানুষ দেখেছে অণবিক অস্ত্রের প্রলয়ঙ্করী ধ্বংস-লীলায় পাশব শক্তির চরম প্রকাশ। একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে উপনীত বিংশ শতাব্দীর মানুষ আজ তাই চিন্তিত হয়েছে কোন্ প্রত্যয়ের বাণী সে শোনাবে আগামী প্রজন্মকে।

মহাত্মাজীর প্রয়োজনীয়তা এখানেই, সার্থকতাও এখানেই। এই গ্লানি ও গনপীড়ার বৌদ্ধিক বিশ্লেষণই করলেন না তিনি, বিকল্প এক শক্তি - আত্মিক ও প্রেম শক্তির উদ্ভাবন ও ব্যক্তি ও সমাজজীবনে তার সাধনা ও যথার্থ প্রয়োগও দেখালেন তিনি। ভেদভাব, হিংসা, শোষণকে মনস্তাত্ত্বিক বিকার বা মহামারীরূপে বর্ণনা করে Psyche বা মন বা মনস্তত্ত্বের আমূল পরিবর্তন চাইলেন তিনি। নিরন্তর সাধনা ও স্বার্থশূন্য সেবার মাধ্যমে আপনার অহংবোধকে দমন করে নৈতিক মূল্য-বোধ প্রতিষ্ঠার কথা বললেন তিনি। বস্তুতঃ মনই সকল কার্যের উৎস স্বরূপ। গান্ধীজী বলছেন, প্রলয়ঙ্করী আণবিক বোমা নিক্ষেপণের পশ্চাতে আছে মানুষেরই যেমন একটি হস্ত, তেমনই ঐ হাতটিকে চালিত করেছে সেই মানুষটিরই হৃদয় বা মন।

এতকাল কেবল পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের কথাই বলেছি আমরা ; তন্ত্র থেকে তন্ত্রে, এক বাদ থেকে অপর এক বাদে ছুটে চলেছি। গান্ধীজীই মূল আধার অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের পরিবর্তনের মাধ্যমে শোষণহীন, তন্ত্রমুক্ত, বিকেন্দ্রিত, সর্বোদয় সমাজভাবনার কথা শোনালেন আমাদের, মানুষ থেকে ইতরতর জীবে যা প্রসারিত।

গান্ধীজীর স্বকীয়তা অন্যখানেও। পথ যেমন তাঁর মৌলিক, পন্থাও বৈপ্লবিক। সত্য ও নৈতিক উপায়ের প্রতি অবিচল আস্থাশীল মহাত্মা আবিষ্কার করলেন 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের, সচেতন আনন্দ, কষ্ট ও ত্যাগের মাধ্যমে ব্যক্তি মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পরিবর্তনের দ্বারা নতুন এক মানবিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যার মূল লক্ষ্য।

জীবিত সীজারের থেকে মৃত সীজার হয়ত আরও শাক্তিশালী হবেন ভেবেছিলেন সেকস্‌পীয়ার্। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে আত্মাহুতির দ্বারা মহাত্মা গান্ধী হয়ত আমাদের কাছে আরও উপযোগী হলেন। তিরিশে জানুয়ারীর মহাপ্রয়াণ হয়ত এই বার্তাই বহন করে।